এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অবহেলিত মানসিক রোগ

ডা. মেজর আব্দুল ওহাব (অব.)
সহকারী অধ্যাপক
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চার সাথে সাথে মানুষ অনেক অজানাকে জেনেছে এবং এ জানার পরিধি বেড়েই চলেছে। আজ যা পৃথিবীতে নেই বলে বিজ্ঞানীরা একমত হচ্ছেন কাল বলেছেন 'না, ভুল হয়েছে - আছে, অস্তিত্ব মিলেছে।' তবে বিজ্ঞান সাধারণত যা দেখা যায় না, তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে অনভ্যস্ত।

শরীর অর্থাৎ দেহ এবং মন নিয়ে মানুষ। শারিরীক রোগকে নানান কারণে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়, দ্রুত রোগীকে চিকিৎসার অধীনে নেয়া হয়। কিন্তু মানসিক রোগকে সেভাবে গ্রাহ্য করা হয় না। শারীরিক রোগের লক্ষণ ও চিহ্নগুলো সাধারণত দেখা যায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এর রোগ উপসর্গ ধরা পড়ে বলে এর সীমাহীন গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে। অথচ পাশাপাশি মানসিক রোগের ক্ষেত্রে শুধুই অবহেলা ও অবজ্ঞা। এমনটা কেন হচ্ছে তা তলিয়ে দেখা দরকার।

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে মানুষ যতোটা জ্ঞান রাখে মনের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে ততোটাই মানুষ অনভিজ্ঞ। আজ থেকে কয়েক'শ বছর আগে শরীর নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে এবং বিজ্ঞান এক্ষেত্রে অনেকদূর এগিয়েছে। কারও হাড় ভেঙ্গে গেলে এক্স-রে করিয়ে কোন হাড় কতটুকু ভেঙ্গেছে বুঝতে পারা যায় এবং বিছানায় শুয়ে কাতরানো লোকটা চিকিৎসার কয়েক মাসের মধ্যেই আবার সেই পা নিয়েই ফুটবল মাঠে খেলতে পারে। এটাতো অনেকটাই ম্যাজিকের মতো। ডায়েরিয়ায় যে শিশুর শরীর থেকে সব পানি নেমে গেছে, চোখ গর্তে চলে গেছে, প্রাণ যায় যায় অবস্থা, মাত্র পাঁচশ সিসি বেবী স্যালাইন তার সকল ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে পারে। রাস্তায় দূর্ঘটনার পর কোন যুবককে অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে আনলে CT Scan করে যে সাবডুরাল হেমাটমা ব্রেইনের পাশে জমা হয়ে ব্রেইনকে চাপ দিচ্ছে, অপারেশন করে সে জমাটরক্ত বের করে, সুস্থ যুবক সচেতনভাবে মায়ের কাছে ফিরে যায়, দুদিন পর চাকরিতে যোগ দেয়। এ সবকিছুই দেখা যায়, পরীক্ষায় সমস্যা নির্ণয় করা যায়। 'যক্ষ্মায় রক্ষা নেই' এমন প্রবাদ ছিল সকলের মুখে মুখে। অথচ এই যক্ষ্মার ব্যাকটেরিয়ার ঔষধ আবিষ্কারের পর একশভাগ গ্যারান্টি দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা হচ্ছে বিশ্বময়। এমনকি লিভারেও যদি ফোঁড়া হয়, তারও চমৎকার চিকিৎসা আছে। ক্যান্সার যেখানেই হোক না কেন তা নির্ণয় করাতো কোন ব্যাপারই না, কারণ

শরীরের সে কোষ তথা টিস্যু পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তা খুব সহজেই বুঝা যায়। এমনকি রক্ত কণিকায় ক্যান্সার হলেও তা নির্ণয় করাও যেমন সহজ এবং তার চিকিৎসাও অসম্ভব নয়। এভাবে সকল ধরনের শারীরিক রোগের ধরন, লক্ষণ, সহজেই চোখে পড়ার মত সে চোখের সমস্যা হোক, কি দাঁতের, পাকস্থলীর ক্ষত হোক কি পিত্তথলীর পাথর। ফুসফুসে পানি জমা হওয়া, বাতাস ঢুকে পড়া যেমন খুব সহজে নির্ণিত রোগ তদ্রুপ হৃদপিণ্ডের যে কোন ধরনের অক্ষমতা বা রক্ত চলাচল সমস্যাও আজ মুহূর্তেই চিহ্নিত করা ও চিকিৎসা দেয়া সম্ভব।

এমনটা মানসিক রোগের বেলায় অনুপস্থিত। মানসিক রোগের লক্ষণগুলো প্রায়ই শারীরিক রোগের বেলায়ও দেখা যায়। তাই প্রাথমিকভাবে রোগীরা এগুলোকে শারীরিক রোগ বলেই বিবেচনা করে মেডিকেল চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন। যেমন মস্তিষ্কে টিউমার হলে বেশি কথা বলা, আবোল তাবোল বকা, বিচার ক্ষমতা লোপ পাওয়া, অস্থির, চঞ্চল হওয়া এমনকি ভাংচুরের মত ঘটনা ঘটানোও সম্ভব। অনেক সময় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে রোগী বিষণ্নতায় ভোগে অথবা , উদ্বেগে ভোগে। মস্তিষ্কের সমস্যার কারণে (স্নায়ুবিক) যখন কারও মধ্যে মানসিক রোগের লক্ষন দেখা দেয় তখন স্বাভাবিক কারণেই লোকজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের নিকট যান চিকিৎসার জন্য। স্নায়ুতন্ত্রের মত বিভিন্ন হরমোনাল সমস্যার কারণেও বা যকৃত সমস্যার কারণে নানাবিধ মানসিক রোগ উপসর্গের সৃষ্টি হয়। চঞ্চলতা, উদ্বেগ, উদ্বেলতা, বিষণ্নতা, আত্মহত্যাপ্রবণতা এ সব কিছুই শরীরে হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে হতে পারে বলে রোগীরা শুরুতেই চিন্তা করে একজন এন্ডোক্রনোলজিস্টকে দেখাই।

মানসিক রোগের লক্ষণগুলো যে মনের শাখা- প্রশাখার অসুস্থতার কারণে হতে পারে এ ধারনা আমাদের দেশে কম। কারণ হচ্ছে মনের অস্তিত্ব নিয়েই নানাজনের নানামত। মনকে আত্মার সাথে মিলিয়ে ফেলা আবার মন ও বিবেক এক জিনিস এমনতর ভাবনাও অনেকের আছে। মূল কথা হচ্ছে যা দেখি না, তা নিয়ে অনেক কথা বলা চলে কিন্তু যা দেখি, যা ছুঁতে পারি তার তো আকৃতি আছে সে নিয়ে অনেক কথা বলার সুযোগ কোথায়। বিলম্বে হলেও এখন আমাদের দেশের লোকজন বুঝতে শিখেছে মন বলে কিছু আছে আর মনের আছে ডালপালা, হাত-পা-নাক-চোখ। বুদ্ধি-বিবেচনা, আবেগ, অনুভূতি, ভাষা, স্মৃতিশক্তি, বিচারক্ষমতা, মনোযোগ, প্রত্যক্ষণ এসবকিছুই মনের শাখা-প্রশাখা। মানুষ এসব কিছুর মাধ্যমে মনের সকল কাজ সম্পন্ন করে। তাই এসব শাখা-প্রশাখার অসুস্থতার জন্য মনের কাজটা সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। এজন্যই মানসিক রোগ অবহেলিত, কারণ এ জন্যই মানুষের এসব বিষয় নিয়ে কোন মাথাব্যাথা নেই যেহেতু তারা এসব কিছু সম্পর্কে অনভিজ্ঞ।

মানসিক রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে রোগীর আত্মীয়স্বজনরা এটাকে বাতাস লাগা, বান দেয়া, জ্বীনে ধরা অথবা ভুতে ধরা কিংবা মানুষের ক্ষতি বলে নানান ধরনের টাইটেল দিয়ে ওঁঝা, কবিরাজ, পীর-ফকির, গণকসহ পল্লী চিকিৎসকদের কাছে ভীড় জমান। সেখানে সস্তাবুলিতে এরা মুগ্ধ হন, চিকিৎসা ব্যয়ভারও কম। মূল কথা হচ্ছে অজ্ঞতাই এখানে বড় উপাদান যা মানসিক রোগকে চিকিৎসার কাছাকাছি নেয়া থেকে বিরত রাখে। সাধারণ মানুষ যারা কোন শিক্ষাই নেননি গ্রামে-গঞ্জে বাস করেন তারা এমনটা করলে আপত্তি নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজনও মানসিক রোগকে স্বীকার করতে চান না। যখন নিজের ঘাড়ে পড়ে তখন হাজার ঘাট হাতিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন বটে কিন্তু ততক্ষণে বেশ বিলম্ব হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশে চিকিৎসকরাও মানসিক রোগকে স্বীকার করতে চান না। দুঃখজনক হলেও সত্যি তাদের একাংশ মানসিক রোগকে একদমই পাত্তা দিতে চান না - অনেকেই এ বিষয়টা আদৌ বুঝেনই না। মানসিক রোগীকে 'পাগল' বলে আমাদের সমাজে যে গালমন্দ করার রীতি চালু রয়েছে তা মোটেই কাম্য নয়। মানসিক রোগের কোন উপসর্গ নিয়ে (তা সামান্য চাপ হোক বা মন খারাপ হোক) কেউ চিকিৎসকের কাছে উপস্থিত হলে তার পিঠে পাগলের সিল মেরে দেবার প্রবণতা সমাজের অধিকাংশ লোকের মধ্যে বিরাজমান।

আরও কারণ রয়েছে মানসিক রোগকে অবহেলা করার। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এ জন্য যথেষ্ট দায়ী। কোন সংসারে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বা মানসিক রোগী থাকলে অভিভাবক বা আত্মীয়স্বজনরা এটাকে খুব লজ্জার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে নিজেদেরকে ছোট ভাবতে শুরু করে। অন্য দশজনের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে বিষয়টি। অথচ শরীরের মতই যদি মনের গুরুত্ব থাকতো তবে এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের অভিভাবক মহল এতোটা শঙ্কা বা লজ্জাবোধ করতেন না। এর পেছনে একটি কারন হচ্ছে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞানের অভাব আর দুই হচ্ছে সমাজের কুসংস্কার বা কুসংস্কার না বললেও সামাজিক দৃষ্টি বা দৃষ্টিভঙ্গিতো বলতেই হবে। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনেক দিনের ব্যবধানে তৈরি হয় এবং তা নিমিষেই মুছে ফেলা যায় না। শুধুমাত্র বহুদিনের অল্প অল্প অর্জন ধুয়ে ফেলতে পারে এ কুকৃষ্টিকে।

মানসিক রোগকে আর অবহেলা নয়। অন্যান্য রোগের মতই এটাকেই রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে তার চিকিৎসা নেয়া প্রয়োজন। রোগীর ভোগান্তি, পরিবারের অশান্তি ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা বিবেচনা করে সকল প্রকার কুসংস্কার ও মতামতকে তুচ্ছজ্ঞান করে রোগ চিহ্নিত হবার সাথে সাথে রোগীকে চিকিৎসার আওতায় আনা জরুরী। দু'শ্রেণীর লোক এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে রোগীর অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনবৃন্দ। তারা টের পেয়েই রোগীকে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের কাছে নেবেন এর বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার জন্য। তারা শুধুই বিবেচনা করবেন তাদের পরিবারের সদস্যটির কল্যাণ ও সুস্থতা। কে কী বলে তাতে কিছু যায় আসে না। তাই সমস্যার আশেপাশে ঘোরাফেরা না করে সমস্যার মূলে যাওয়া জরুরী। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ও মনোচিকিৎসক, মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট। যাদের কাছে এলে রোগীর অভিভাবক বুঝতে পারবেন যে সঠিক স্থানেই তিনি এসেছেন। অতি যত্ন সহকারে এ জাতীয় রোগীর চিকিৎসা দেবেন চিকিৎসক এটাই কাম্য। যথেষ্ট ধৈর্য রাখতে হয়। শুধু রোগীরা নয় কখনো অভিভাবকরাও চিকিৎসকদের বিরক্ত করেন। দীর্ঘদিন চিকিৎসা চালাতে গিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে অস্বচ্ছল বাবা মা অসুস্থ হয়ে যান। তাদের মেজাজ মর্জি অনেক সময়ই ভাল থাকে না। এমতাবস্থায় তারা চিকিৎসকদের সাথে যথাযথ আচরণ করতে ব্যর্থ হলেও চিকিৎসকদের উচিত যথেষ্ট ধৈর্য্য ও উদারতার সাথে উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবেলা করা।

'স্বশিক্ষিত মানুষ মাত্রই সুশিক্ষিত' প্রমথ চৌধুরীর চমৎকার এ বাক্যটিকে আমরা যদি এক্ষেত্রে আবার স্মরণ করি ও নিজেদেরকে শুধরে নেবার জন্য ব্যবহার করি তবে হয়তো আমাদের সমাজের মানসিক রোগীরা আর অবহেলিত থাকবে না। ফিরে পাবে তারা তাদের মানবিক অধিকার।